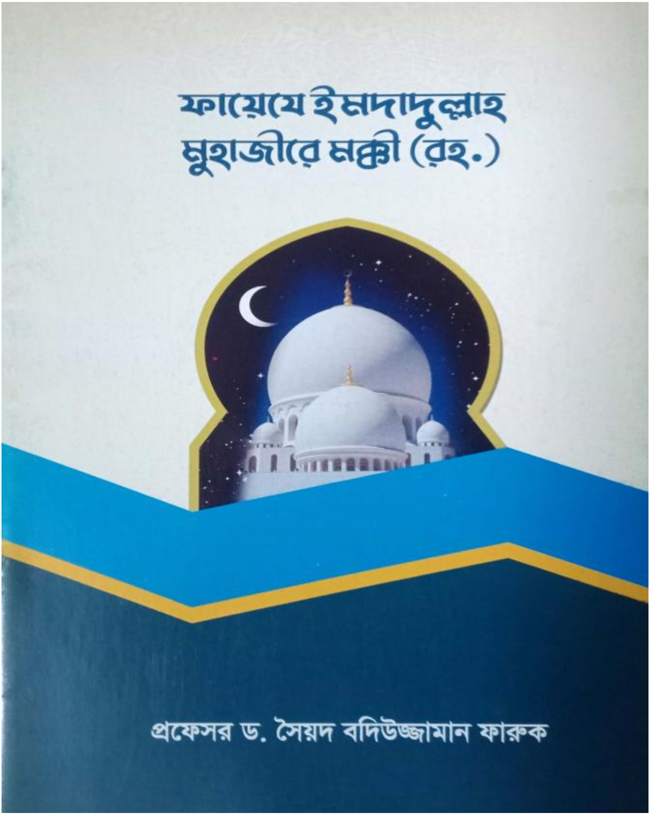
ফায়েযে ইমদাদুল্লাহ
মুহাজীরে মক্কী (রহ.)
প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

ফায়েযে
ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ)

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

ফায়েযে ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ)

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

প্রকাশকঃ গ্রন্থকার
প্রকাশকালঃ মার্চ, ২০২৩

গ্রন্থস্বত্বঃ প্রকাশক

বিনিময় মূল্যঃ ১৫০ টাকা

Fayeze Hazrat Haji Imdadullah Muhajira Makki (R.A) By Professor Dr. Syed Badiuzzaman Faruque, Professor of Physics at Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet, Bangladesh.

উৎসর্জন

“শ্রদ্ধেয় আব্বাজান ও আম্মাজানের রূহের মাগফিরাত কামনায় উৎসর্গিত”।

সূচী

ভূমিকা/ ৬
১। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী/ ১০
২। বায়আ'তের বর্ণনা/ ১৮
৩। বায়আ'তের পর মুরীদের করণীয়/ ২৩
৪। যিকিরের গূঢ়ার্থ/ ২৮
৫। চিশতীয়া তরীকার যিকির ও শুগলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা/ ৩৩
৬। হযরত (রহঃ) এর অমূল্য উপদেশাবলী/ ৪১

ভূমিকা

কোন কাজ করতে হলে সে কাজের নিয়মনীতি জানা আবশ্যক। বিশেষতঃ ব্যবহারিক বিষয়ের জন্য হাতে কলমে শিক্ষা নেয়ার জন্য ঐ বিষয়ের শিক্ষক বা Practitioner এর সঙ্গে থেকে বিষয়টি শিখতে হয়। ইসলামী শরীয়ত একটি ব্যবহারিক বিষয়। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আল্লাহর আদেশ নিষেধ ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নত পালন করে চলার নামই শরীয়ত অনুসরণ। শরীয়ত অনুসরণ করার পথ ও পদ্ধতি কেবল গ্রন্থ্ পাঠ ও ওয়াজ শুনে আয়ত্ত হয় না। শিক্ষক বা মুর্শিদের সঙ্গে থেকে অনুশীলনের মাধ্যমে তা আয়ত্ত হয়। অনুধাবন করুন যে, আল্লাহতায়ালা কেবল কুরআন নাযিল করেননি বরং কুরআনের শিক্ষা ব্যবহারিক জীবনে কীভাবে পালন করতে হবে তা শিক্ষা দেয়ার জন্য কুরআনের বাস্তবচিত্র হিসেবে রাসূল (সাঃ) কে প্রেরণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাঃ)-কে দেখে দেখে ইসলাম অনুশীলন করেছেন।

ইসলামের ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়ার জন্য সকল যুগেই সত্যপন্থী ব্যক্তিত্ব থাকবেন মর্মে কুরআনী প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহতায়ালা ঐ সব সত্যপন্থীদের সঙ্গী হয়ে ব্যবহারিক ইসলাম শিক্ষার আদেশও দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, "হে ঈমানদারেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যপন্থীদের সঙ্গী হয়ে যাও।" (আল-কুরআন, ৯ঃ১১৯)।

বস্তুত: ইসলামের ব্যবহারিক শিক্ষার প্রধানতম স্তম্ভই হলো আল্লাহকে ভয় করে সকল পাপ ও মন্দ কর্ম পরিহার করা এবং পূণ্য ও পবিত্র কর্মে আত্মনিয়োগ করা। এ কাজ শিখতে হলে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা হলো সত্যপন্থীদের সঙ্গী হয়ে যাওয়া। রাসূল (সাঃ) এর যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান প্রধানত এই পন্থায়েই হয়েছে।

কোন পরহেজগার, খোদাভীরু, শরীয়তঅনুসারী, খাঁটি আলেম যিনি পূর্ববর্তী অনুরূপ শিক্ষকের নিকট থেকে দ্বীনের ব্যবহারিক শিক্ষা পেয়েছেন এবং তা পরবর্তীদের মাঝে

পৌঁছাবার ইযাযতপ্রাপ্ত, তেমন একজন ওলীর সোহবতে থেকে দ্বীনী বিষয়াদীর ব্যবহারিক শিক্ষা নেয়ার নামই তরীকত। এ কোন নব আবিষ্কার বা বেদআত নয়। তরীকত হলো শরীয়তের শিক্ষা অনুসরণের জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি যে পন্থায় চেষ্টাসাধনা করেন তার অপর নাম। এ কোন তুচ্ছতাচ্ছিল্যের বিষয় নয় বরং পূর্ববর্তী যুগ থেকে অনুসৃত হক ও সুন্দর, কার্যকর ও প্রশংসনীয় এক কর্মপ্রচেষ্টা যার মাধ্যমে মুসলমান দুনিয়ার অস্থির জীবন শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করে কবরে, হাশরে শান্তি লাভ করবে ও পরিশেষে জান্নাতের মহানেয়ামত লাভ করে ধন্য হবে। ইতিহাসের পাতায় এমন কোন খাঁটি আলেম-ওলীর দেখা পাওয়া যায়না যিনি তরীকতের নিন্দা করেছেন কিংবা একে গ্রহণ না করেছেন।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ)

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ) আরব ও আজমে তরীকতের ইমাম ছিলেন। প্রায় পাঁচশত আলেমে

দ্বীন তার হাতে বাইয়াত হন। তিনি অত্যন্ত স্বচ্ছ দিলের অধিকারী ও মহান বুযুর্গ ছিলেন। ভারতবর্ষে ইসলামকে জিন্দা করায় তার অবদানই সর্বোচ্চ। তিনি 'যিয়াউল কুলুব' নামক কিতাবে তরীকতের যিকির শুগল সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা করেছেন। এই কিতাব খানা এক স্বর্ণের খনি। আমি ইতোপূর্বে হযরতের অমূল্য উপদেশাবলী একত্র করে ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেছি। বক্ষমান গ্রন্থটিতে চিশতিয়া তরীকার যিকির শুগল- 'যিয়াউল কুলুব' কিতাব থেকে সংক্ষেপে তুলে ধরছি, পূর্বের উপদেশগুলোও থাকছে। আমি বক্ষমান বইটিকে সহজ সরল ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে আমি যিয়াউল কুলুবের অনুবাদ যা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ করেছেন- তা থেকে সাহায্য নিয়েছি।

আশা করি আল্লাহ পাক আমার ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন ও পাঠকবর্গ এর দ্বারা যুগ যুগ ব্যাপি উপকৃত হতে থাকবেন।

ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

অধ্যায় এক

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ) ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের সাহারানপুর জেলার নানুতা নামক শহরে ১৮১৭ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরআনের হাফেজ ছিলেন। ৯ বছর বয়সে দিল্লী গমন করেন এবং আরবী, ফারসী শিক্ষা করেন। তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তেমন এগোয়নি বরং তিনি রূহানিয়াতের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ১৮ বছর বয়সে শায়েখ মাওলানা নাসিরুদ্দিন নকশবন্দীর হাতে বাইয়েত হন ও অল্প কদিনের মধ্যে ইযাযত লাভ করেন। ইত্যবসরে তিনি হুজুর (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখেন ও এই স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝানঝানবীর হাতে পুনরায় বাইয়েত হন। অল্প কদিনের মধ্যে শায়েখ তাকে খেলাফত দিয়ে ধন্য করেন। মিয়াজী (রহঃ) এর ইন্তেকালের পর তিনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে পড়েন এবং লোকালয় থেকে দূরে পাঞ্জাবের বনবাদাড়ে থাকা শুরু করেন। এসময় তিনি একাধারে ৮দিন পর্যন্ত অনাহারে থাকতেন। ৬ মাস লোকালয় থেকে দূরে থাকার পর পুনরায় তিনি নবী করীম

(সাঃ)-কে স্বপ্নে যিয়ারত করেন এবং এর ভিত্তিতে হজব্রত পালনের জন্যে মক্কায় তশরিফ নিয়ে যান। মদীনার যিয়ারত শেষে হযরত শাহ ইসহাক মুহাজীরে মক্কীর নির্দেশে ভারতে চলে আসেন। ভারতে ফিরে আসার পর লোকেরা তার নিকট বাইয়াত হবার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করে কিন্তু তিনি বিনয়ের সাথে অপারগতা প্রকাশ করতে থাকেন। অবশেষে যখন তিনি বুঝতে পারেন যে এ হলো খোদার অভিপ্রায়, তখন থেকে লোকদের বাইয়াত করা শুরু করেন।

১৮৫৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি থানাভনে আযাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এরই ধারাবাহিকতায় এক যুদ্ধে, যা শামেলীর যুদ্ধ নামে মশহুর, তিনি সিপাহসালারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে পরাজয়ের পর আলেম সমাজের জীবনে অবর্ণনীয় জুলুম নির্যাতন নেমে আসে। বাধ্য হয়ে অতঃপর তিনি ভারতের মাটি চিরকালের জন্যে ত্যাগ করে মক্কায় হিজরত করেন।

মক্কায় তিনি প্রথম দিকে খুবই কষ্টে ছিলেন। অতঃপর আল্লাহতায়ালা তার জন্যে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে বেলায়েতের এক ঈর্ষনীয় মাকাম দান করেন। যদিও তিনি বড় আলেম ছিলেন না কিন্তু তার বেলায়েত আরব আজমের সর্বত্র স্বীকৃতি পেয়েছে এবং প্রায় ৫০০ আলেম তার কাছে বাইয়েত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ), কুতবে যমান মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহঃ) ও মুজাদ্দিদে যমান মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) অন্যতম। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মদনী (রহঃ) মক্কায় তাঁর কাছে সুলুকের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তাঁর সোহবতে লক্ষ লক্ষ খোদাপ্রেমিক সঠিক পথের দিশা লাভ করেছেন।

হযরত হাজী সাহেবের (রহঃ) এত্তেবায়ে শরীয়ত ও কারামত

তাসাউফের উচ্চতর মর্যাদা লাভের পরও হাজী সাহেব (রহঃ) জাহেল সূফীদের বিপরীতে শরীয়তের উপর খুবই মজবুত ও পাবন্দ ছিলেন। প্রত্যেক কাজে ও কথায় এবং

চালচলন, উঠাবসায় সর্বদা সুন্নতের প্রতি সূক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি সাহেবে কারামত হওয়া সত্ত্বেও কারামতকে তাসাউফের ও বেলায়েতের দলিল মনে করতেন না। একদা হযরত হাজী সাহেবের বাসায় অনেক মেহমান আসেন। প্রয়োজনের তুলনায় খাবার কম ছিল। হাজী সাহেব (রহঃ) নিজ রুমাল পাঠিয়ে আদেশ করলেন খাবার ঢেকে রাখতে। ফলে খাবারে এত বরকত হলো যে সকলে খাওয়ার পরও অনেক খাবার রয়ে যায়। এই ঘটনা হযরত জামেন শহীদ (রহঃ) জানতে পেরে বললেন, হযরত আপনার রুমালের ছালামতি কামনা করি যেহেতু অভাব আর দেখা দিবে না। হাজী সাহেব (রহঃ) লজ্জিত হয়ে বললেন, বাস্তবিকই ভুল হয়ে গেছে। তওবা করছি, ভবিষ্যতে আর কখনো এমন হবে না।

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) এর মশহুর কারামত যা বিভিন্ন কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে তা এই, ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক ও মুজাহিদগণকে ইংরেজরা যখন খুঁজে খুঁজে গ্রেফতার করছিল তখন হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)

আম্বালা জেলার অন্তর্গত কানজালা নামক স্থানে রইছ জনাব রাও আবদুল্লাহ সাহেবের বাসভবনে আত্মগোপন করে ছিলেন। তখন জনৈক ইংরেজ জেলা প্রশাসককে সংবাদ দিল যে মোজাফফরনগর জেলার জেহাদের আসামী হাজী সাহেব তাঁর মুরীদ রাও আবদুল্লাহ সাহেবের আস্তাবলে আছেন। এ খবর পেয়ে জেলা প্রশাসক নিজেই রাও আবদুল্লাহ সাহেবের বাড়ী এসে বললেন, আমি খবর পেয়েছি আপনার নিকট ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর তেজস্বী ঘোড়া আছে। আমি ঐগুলি দেখতে চাই। অতঃপর আস্তাবল খুলে দেয়া হলো। আর হাজী সাহেবের মুরীদ রাও সাহেব খুবই আতঙ্কিত হয়ে গেলেন। ইংরেজ জেলা প্রশাসক ভেতরে ঢুকে দেখল জায়নামাজ বিছানো, অজু করার বদনা মজুদ, পানি দ্বারা মাটি ভেজা। জেলা প্রশাসক রাও সাহেবকে প্রশ্ন করলেন আস্তাবলে নামাজের ব্যবস্থা কেন। রাও সাহেব বললেন, ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ফরজ নামাজ মসজিদে পড়া এবং নফল নামাজসমূহ ঘরে পড়া উত্তম। অতএব আমরা নফল ইবাদাত করার ব্যবস্থা ঘরেই করে থাকি। সুতরাং একারণেই এখানে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অতঃপর

জেলা প্রশাসক যখন চলে গেলেন তখন হাজী সাহেব (রহঃ) কে জায়নামাজের উপরই দেখা গেল। এ হলো একটি কারামতের ঘটনা। হাজী সাহেব (রহঃ) এর জীবনে আরো অনেক কারামতের দেখা মেলে। তিনি আরব ও আজমের সর্বজন স্বীকৃত শায়েখ ছিলেন। তখনকার সময়ের আউলিয়াগণ হাজী সাহেবের বেলায়েতের উপর একমত ছিলেন এবং ঐ যুগের উলামায়ে কেরাম হাজী সাহেবের ইলমের উচ্চ মর্যাদা স্বীকার করতেন। আল্লাহতায়ালা তাঁকে ইলমে লাদুন্নী দ্বারা ধন্য করেছিলেন।

হাজী সাহেব (রহঃ) ৫০/৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। অতঃপর গায়েবী ইশারায় আদিষ্ট হয়ে তাঁর ভক্ত সৈয়দ হায়দার আলীর স্ত্রী বিবি নুরানের অনুরোধে তার নাতনী খাদিজার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অতঃপর তিনি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আরো দুই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু কোন স্ত্রীর তরফেই তাঁর কোন সন্তান জন্ম নেয়নি। শেষ জীবনে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর ১৮৯৯ সনের ১৮ই অক্টোবর বুধবার ফজর আযানের ওয়াক্তে তিনি

মাওলায়ে হাক্কিকীর উদ্দেশ্যে এই নশ্বর ধরাধাম ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। পবিত্র মক্কার জান্নাতুল মুয়াল্লায় তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।

অধ্যায় দুই

বায়আ'ত এর বর্ণনা

আল্লাহর পথের পথিককে আল্লাহর পথে চলার এবং সীরাতে মুস্তাকীমে যাত্রার তওফীক যখন দেয়া হয়, তখন তার অন্তর হেদায়াতের জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠে। গোমরাহীর পথভ্রষ্টতার অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর নূর অর্জনের দিকে ধাবিত করেন। আল্লাহ প্রদত্ত এই নূরের প্রভাবে তার অন্তরে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা এবং আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। নিজের পাপের কথা স্মরণ করে তওবার রজ্জু হাতে নিয়ে গাফুরুর রহীম, সকল প্রয়োজন পূরণের কেন্দ্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিকে সে নিজ অন্তরকে নিবিষ্ট করে। এসময় কোন একজন কামিল মুরশিদের দরবারের আশ্রয় ব্যতিত পুরোপুরি সফল হওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেনা। সুতরাং তার জন্য এসময় শরীয়ত ও তরীকত উভয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন মুরশিদের অধীনস্ত হবার গৌরব অর্জন করা উচিত। তাতে করে সে শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও কু প্রবৃত্তির তাড়না থেকে রক্ষা পেতে পারে। বাতেনী রোগের ব্যাপারে কামেল মুরশিদের বাতানো ঔষধ পথ্যাদি তার ব্যবহার করা কর্তব্য। কারণ,

বাতেনী রোগগুলোর (যথা হিংসা, কৃপণতা, অহংকার, দ্বেষ, রিয়া ইত্যাদি) মূলোৎপাটন ছাড়া জ্ঞান, সহনশীলতা, বদান্যতা, বিনয়, নিজেকে ছোট মনে করা, কম খাওয়া, কম কথা বলা ইত্যাদি সদগুণ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। এজন্যই কোন মুরশিদে কামেলের দরবারে হাজিরী দেওয়া প্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন, “হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর, আর সত্যপন্থীদের সাথে থাকো।”আল্লাহ আরও বলেছেন, “যারা আমার দিকে রুজু হয়, তাদের পথ অনুসরণ কর।” এই উভয় আয়াতেই আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এতে বুঝা যায়, এই নির্দেশটি অবশ্য পালনীয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি ওয়াজিব। বায়আ'ত হওয়া এবং মুরশিদে কামেলের হস্ত ধারণ করা এমন একটি কাজ যার সম্পর্ক হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে যুক্ত। আল্লাহর কালামে রয়েছে, “হে নবী, আপনার হাতে যারা বায়আ'ত করে তারা মূলতঃ আল্লাহর হাতেই বায়আ'ত করে।” রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, “উম্মতের

তুলনায় নবীর মর্যাদা যেমন, শায়েখ ও মুরশিদের মর্যাদা তাদের সম্প্রদায়ে তেমন।” এ বিষয়ে বুযুর্গানে দ্বীনের অভীমত হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার সাহচর্য লাভের আগ্রহ করে তার সূফী ও অলীউল্লাহগণের খেদমতে হাজিরী দেয়া উচিত।

শায়েখগণ যেহেতু নায়েবে-নবীর মর্যাদায় অভিষিক্ত, সুতরাং তাঁদের খেদমত করাও একান্ত জরুরী। যে ব্যক্তি শায়েখে কামেলের খেদমতে সময় কাটাবে, তাঁকে নিজের উপর পূর্ণ অধিকার দিয়ে দিবে, তার সম্পর্কে দৃঢ় আশা করা যায় যে, অবশ্যই সে স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হতে পারবে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায়, যা হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) লিখেছেন, বায়আ'ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাই আমার আরজ তালেবে ইলাহী ব্যক্তিবর্গ সময় নষ্ট না করে দ্রুতই একজন শায়েখে কামেলের হস্ত ধারণ করে বায়আ'ত হয়ে যিকির ও শুগলে লিপ্ত হয়ে যাবেন। দুনিয়াকে দুই নম্বরে ফেলে এক নম্বরে

আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের স্থান দেবেন। এই প্রসঙ্গে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) রচিত বায়আ'ত গ্রহণের তরীকা 'যিয়াউল কুলুব' কিতাবে দেখে নেবেন।

অধ্যায় তিন

বায়আ'তের পর মুরীদের কর্তব্য

বায়আ'তের পর মুরীদের কর্তব্য হলো শায়েখের শিখিয়ে দেয়া ওযিকা, যিকির, মুরাকাবা ইত্যাদি যা শায়েখ বাতান-তা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে হিম্মতের সাথে আদায় করা। এতেই মুরীদ দিন দিন উন্নতি লাভ করে এক পর্যায়ে কামেল ও মুকাম্মাল হয়ে যেতে পারেন। হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) এর মতে সুলুকের যাত্রীদের তিনটি তরীকা দেখতে পাওয়া যায়।

১। সালেহীন ও শ্রেষ্ঠ লোকদের তরীকাঃ এই তরীকায় শরীয়তের সকল ফরজ কাজ যথা-নামায, রোযা, তিলাওয়াতে কুরআন, জিহাদ, হজ্জ ইত্যাদি আদায় করে চলতে হয়। এ পদ্ধতিতে মনযিলে মকছুদে পৌঁছাতে কিছু সময় লাগে।

২। রিয়াযাত মুজাহাদা ও সাধনকারীদের তরীকা: এ তরীকায় চারিত্রিক দোষ সমূহকে সদগুণাবলীর দ্বারা এবং সকল ধরনের বক্রতাকে সুন্দর নৈতিক গুণাবলী দ্বারা

প্রতিস্থাপিত করে নেয়া হয়। এ পথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলতা লাভ করা যায়।

৩। শাত্তারিয়াগণের তরীকাঃ এই তরীকায় সালেক সকল জাগতিক আবিলতা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে মানুষের সংসর্গ থেকে আলাদা হয়ে থাকেন। প্রেমাস্পদ আল্লাহর সাথে তীব্র মিলন আগ্রহ এবং যিকির ও শুগল, স্মরণ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ভিন্ন এদের লক্ষ্য পথে আর কিছু থাকে না। মৃত্যুর পূর্বেই মরে যাবার অনুশীলনে দৃঢ়তার সাথে তারা নিজেদের সময় ব্যয় করেন। এ তরীকায় প্রথমোক্ত দু'তরীকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুত মূল উদ্দেশ্যে সফল হওয়া যায়। এই তরীকায় সফল হবার জন্য দশটি উপায়।

এক-তওবা। আল্লাহ ব্যতিত আর কিছুর তলব ও মকছুদ যেন না থাকে।

দুই- যুহদ। মৃত্যুর সময় যেমন জাগতিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তেমনি এখানেও যেন দুনিয়া ও এর কোন কিছুর সাথে তার কোনরূপ সম্পর্ক না থাকে।

তিন-তাওয়াক্কুল। সকল বিষয়ে, সকল পরিস্থিতিতে, সকল সময়ে সকল গাইরুল্লাহকে পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহকে ভরসাস্থল বানানো।

চার-কানাআ'ত। নফসানী কোন খায়েশ, রিপু, প্রবৃত্তি ইত্যাদির কোন তাড়না যেন না থাকে যেমনটি মৃত্যুর সময় হয়।

পাঁচ-আযলত। মৃত্যুর সময় যেমন মানুষের সঙ্গ লাভের কোন সুযোগ থাকে না, তেমনি এখানেও যেন সে মানুষের সংসর্গ ত্যাগ করে।

ছয়-তাওয়াজ্জুহ্। মৃত্যুর সময় যেমন লক্ষ্য শুধু মাত্র আল্লাহর দিকেই নিবদ্ধ থাকে, তেমনি এ জীবনেও যেন তাই থাকে।

সাত-সবর। সকল জাগতিক সম্ভোগ পরিত্যাগ করে ফেলা যেমনটি মৃত্যুর সময় অবশ্যই দেখা দেয়।

আট-রোযা। কেবল আল্লাহতায়ালার ইচ্ছার উপরই তুষ্ট হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর সনাতন হুকুম-আহকাম পালন করতে থাকা।

নয়-যিকির। সকল কিছুর স্মরণ বিস্মৃত হয়ে একমাত্র আল্লাহর যিকির ও স্মরণেই লিপ্ত থাকা।

দশ-মুরাকাবা। মৃত্যুর সময়কালের মত এখানেও যেন সে নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ ত্যাগ করে ফেলে।

মোট কথা-প্রত্যেক আল্লাহ অন্বেষীর উচিত শায়েখে কামেলের অনুসরণের মাধ্যমে বস্তুজগতের কলুষতার ফলে উৎপন্ন সকল প্রকার অসৎ অভ্যাস থেকে নিজেকে রক্ষা করা। সৎ সুন্দর চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করে তোলা আর কেবলমাত্র আল্লাহর ধ্যান ব্যতিত আর কিছুই যেন তার অন্তরে স্থান না পায়।

অধ্যায় চার

যিকিরের গূঢ়ার্থ

সূফীগণের পরিভাষায় যিকির বলা হয় আল্লাহর স্মরণে এমনভাবে নিমগ্ন থাকা যেন আল্লাহ ব্যতিত বাকী আর সকল কিছুই বিস্মৃত হয়ে যায়। হুযুরে ক্বালবের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সংসর্গের ধ্যান যেন তার অর্জিত হয়। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, "আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে এবং আমার নামের যিকিরে তার ওষ্ঠ নড়তে থাকে তখন আমি তার সঙ্গী হয়ে যাই, আর আমাকে যে ব্যক্তি স্মরণ করে আমি তার সাথী"।

কুরআন পাকের নির্দেশ, "সকাল বিকাল (সর্বক্ষণ) তোমার আল্লাহর তসবীহ কর", অনুসারে পুরোপুরি ধ্যানের সাথে এমনভাবে আল্লাহর যিকিরে মগ্ন হয়ে থাকবে যেন স্বীয় সত্তার উপলব্দিও তার নিকট থেকে লুপ্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন, "যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ যিকিরে মগ্ন সে সকল মুমিনদের অন্তর্ভূক্ত যেন সে হয়।"

যিকির বহু প্রকার। পরম আরাধ্য আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভ করাই যিকিরের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং নামায, রোযা, দরূদ শরীফ, দু'আ অর্থাৎ যে আমল দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্যে সফল হওয়া যায় তাই মূলতঃ যিকির বলে গণ্য। কিন্তু যিকিরকারী যতক্ষণ পর্যন্ত এমনভাবে যিকিরে নিমগ্ন না হয় যাদ্বারা আল্লাহ ব্যতিত আর সকল কিছু থেকে সে বিস্মৃত হয়ে পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত তার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না। খোদা অন্বেষী ব্যক্তি ঐ মহান মর্যাদায় যখন পৌঁছবে তখন যুহদ, তাওয়াক্কুল, নির্জনপ্রিয়তা, অল্পোতুষ্টি, ধৈর্য্য, তালীম ও রেযা বা আল্লাহর যে কোন ফয়সালা দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেওয়া এবং তার উপরই সন্তুষ্ট থাকা ইত্যাকার চারিত্রিক গুণ তার মধ্যে আপনা আপনিই এসে যাবে। তার উপর তখন আনওয়ারে ইলাহীর এত তাজাল্লী হতে থাকবে যে, ক্রমে তার ইন্দ্রিয়সমূহ অবদমিত ও অবগুণ্ঠিত হয়ে যাবে এবং যিকির ও যিকিরকারীর সত্তা সকল কিছুই তার ধ্যান হতে অবলুপ্ত হয়ে গিয়ে কেবলমাত্র মাযকুর অর্থাৎ আল্লাহতায়ালাই তার সর্ব উপলব্দিতে বিরাজ করতে থাকবেন। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" - এই কালিমার যিকির সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির বলে

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে অধিকাংশ পীর ও মাশায়েখ মুরিদগণকে এই যিকিরেরই - তা'লীম দিয়ে থাকেন।

যিকিরের স্তরসমূহঃ যিকির চার প্রকার। প্রথম- যিক্রে নাসূতী, যেমন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
দ্বিতীয়- মালাকূতী, যেমন, ইল্লাল্লাহ।
তৃতীয়- জাবারুতী, যেমন, আল্লাহ।
চতুর্থ- লাহুতী, যেমন, হুয়া হুয়া।

জেনে রাখুন- যবানের যিকিরকে নাসূতী, কালবের যিকিরকে মালাকূতী, রুহের যিকিরকে জাবারুতী, সিরের যিকিরকে লাহুতী বলা হয়ে থাকে।

আর যবানী যিকিরকে জিস্মি (শারীরিক) ধ্যানরূপ যিকিরকে নাফসী (মানসিক), মুরাকাবা করাকে যিকরে কালবী, মুশাহাদা (সমক্ষ দর্শন) রূহানী যিকির এবং মুআয়ানা করাকে (উপস্থিত দর্শন) সিররি বলা হয়।

ফায়দাঃ যিকিরকারী এই যিকির করার কালে লা ইলাহা বলার সময় পৃথিবীর সবকিছু নিজ থেকে অবলুপ্ত করে দিবে আর ইল্লাল্লাহ বলার সময় পুনরায় ধাতস্ত হবে।

অধ্যায় পাঁচ

চিশতীয়া তরীকার যিকিরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

১। বার তসবীহ যিকিরের বর্ণনা

বার তসবীহ যিকির করার নিয়ম হলো- দুই দুই রাকাত করে বার রাকাত তাহাজ্জুদের নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করবে। পরে অতীব বিনয় নম্রতা ও খুশু-খুজুর সাথে তিন বা সাতবার হাত উঠিয়ে পড়বে-

"আল্লাহুম্মা তাহ্হির ক্বালবী আন গায়রিকা ওয়া নাব্বির ক্বালবী বিনূরী মা'রিফাতিকা আবাদান ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ"

অর্থাৎ "হে আল্লাহ তুমি ব্যতিত বাকী সবকিছু থেকে আমার মন পাক করে দাও, তোমার মা'রিফাতের নূরে আমার ক্বালব আলোকিত করে দাও সব সময়ের জন্য, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! হে আল্লাহ!"

পরে একুশবার ইস্তিগফার পাঠ করবে। অতঃপর নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ আরোহ ও অবরোহ তরীকায় তিনবার পাঠ করবে। "আসসালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ! আস সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহ!"। অতঃপর চারজানু হয়ে বসবে। ডান পায়ের

বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং এর পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলের সাহায্যে কীমাস নামক রগটিকে (হাঁটুর মধ্যস্থিত একটি শিরা) খুব চেপে ধরবে, উভয় হাত হাঁটুর উপর ছেড়ে রাখবে এবং কেবলামুখ হয়ে বসবে। 'লা ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত অঙ্গুলী উঠাবে, আর ইল্লাল্লাহ বলার সময় সেটি নামিয়ে ফেলবে। নিজেকে সুস্থির করে রাখবে এবং ইখলাসের সাথে এবং মধুর আওয়াজে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" তিনবার এবং কালিমা শাহাদাত একবার পাঠ করবে। এরপর মাথা এতটুকু ঝুঁকাবে যেন তা বাম হাঁটু পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে লা ইলাহা উচ্চারণ করবে। একই দমে তিনবার জবর লাগিয়ে মাথাকে পিঠের দিকে ঝুঁকাবে এবং ধ্যান করবে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছু আমি পিছনে নিক্ষেপ করলাম। অতঃপর শ্বাস ছেড়ে দিয়ে পূর্ণ শক্তির সহিত দিলে ইল্লাল্লাহ' এর জরব লাগাবে। তখন ধ্যান করবে আমার হৃদয় আল্লাহর ইশক ও মুহাব্বাতে আপ্লুত হয়ে উঠেছে। নফীর সময় চোখ খুলে রাখবে এবং ইসরাতের সময় চক্ষু মুঁদে রাখবে।

এভাবে এ যিকির দু'শত বার করবে। অতঃপর 'ইল্লাল্লাহ' এর জরব দিলের উপর লাগিয়ে চারশত বার পূর্ণ করবে। অতঃপর "আল্লাহু আল্লাহ" যিকির ছয়শত বার পূর্ণ করবে। অতঃপর 'আল্লাহ' নামের যিকির একশত বার পড়বে। যিকিরের পরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মাশায়েখে তরীকতের পবিত্র রূহের উপর ফাতিহা ও ইসালে সাওয়াব করবে।

২। পাস-আনফাসঃ প্রতি প্রশ্বাসে মানুষকে সজাগ ও সতর্ক থাকা উচিত। পাস আনফাস তরীকার সাহায্য নেয়া ছাড়া মানুষের মন কলুষতা ও আধাঁর থেকে মুক্ত হতে পারেনা। সূফীগণের পরিভাষায় পাস আনফাস হচ্ছে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস উভয় সময়েই সরবে বা নীরবে আল্লাহর যিকির করা। এর অনেক পদ্ধতি আছে। তন্মধ্যে একটি হলো- শ্বাস বাহির করার সময় আল্লাহ এবং গ্রহণ করার সময় 'হু' শব্দটি ভিতরে টানবে-আর ধ্যান করবে জাহির ও বাতিন, ভিতর এবং বাহির সর্বত্রই আল্লাহ তায়ালার প্রকাশ বিরাজমান। এত

বেশী করে এ যিকির করবে যে; শ্বাস আপনা হতেই এ যিকরে অভ্যস্ত হয়ে যায়, শয়ন ও জাগরণ সর্বাবস্থায়ই যেন সে যাকির হয়ে থাকতে পারে।

৩। জরবসহ ইসমে যাত (আল্লাহ)-এর যিকির

ইসমে যাত যিকিরের পদ্ধতি হলো -চোখ বন্ধ করে ডান কাঁধের দিকে মাথা টেনে সজোরে দিলের উপর আল্লাহ শব্দের জরব লাগাবে। দুই জরবী যিকিরে প্রথম জরব রূহের উপর (ফুসফুসের উপর) আর দ্বিতীয় জরব দিলের উপর লাগাবে। তিন জরবী যিকিরে প্রথম জরব ডান হাঁটুতে, দ্বিতীয় জরব বাম হাঁটুতে এবং তৃতীয় জরব দিলে লাগাবে। চার জরবীতে প্রথম জরব ডান হাঁটুতে, দ্বিতীয় জরব বাম হাঁটুতে, তৃতীয় জরব রূহের উপর এবং চতুর্থ জরব দিলের উপর লাগাবে।

৪। যিকরে আররার পদ্ধতি

উল্টা শ্বাস টেনে সশক্তিতে ‘লা ইলাহা’ বলে কাঁধ পর্যন্ত মাথা নিয়ে পিঠের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে দিলের উপর ‘ইল্লাল্লাহ’-এর জরব লাগাবে।

৫। মুরাকাবা পদ্ধতি

সালিক যখন জাহেরী ও বাতেনী সকল ধরনের নূরে সমুজ্জল হয়ে উঠে এবং তার শিরা-উপশিরায় যিকরের প্রভাব ছড়িয়ে যায় তখন তার মধ্যে আত্মবিস্মৃতির এক দশার সৃষ্টি হয়। আর এ সময়ই তাকে মুরাকাবা ও ধ্যান পদ্ধতির প্রশিক্ষণ নেয়ার প্রকৃষ্ট সময়।

মুরাকাবা কয়েক প্রকার। খোদা প্রত্যাশী ব্যক্তি যে পদ্ধতিতে উপকার পায় এবং যে পদ্ধতি গ্রহণ করলে সে দ্রুত মনযিলে মকছুদে পৌঁছতে সক্ষম হবে, সে পদ্ধতি অনুসারেই তার কাজে লেগে যাওয়া উচিত। মুরাকাবার কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হলো।

মুরাকাবা-এ রুয়াত বা পরম সত্তার দর্শন ধ্যান

এ পদ্ধতি আল্লাহর দর্শন ধ্যানের পদ্ধতি । "আলাম ইয়া'লাম বি আন্নাল্লাহা য়ারাহ" (অর্থাৎ এ কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন) এই আয়াতের উপর গভীর লক্ষ্য নিবদ্ধ করবে। সব সময় এ ধ্যান অন্তরে জাগরূক রাখবে, যেন ক্রমে তার মধ্যে ঐ পরম সত্তাকে প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

মুরাকাবা-এ-মায়িআত বা পরম সত্তার সংসর্গের ধ্যান

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন "ওয়াহুয়া মা'আকুম আইনামা কুনতুম (যেখানেই তোমরা থাকনা কেন আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন) , এই আয়াতটির মর্ম ধ্যান করবে। দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে গোপন ও প্রকাশ্য, সুস্থতা ও অসুস্থতা সকল অবস্থায়ই আল্লাহ আমার সঙ্গে রয়েছেন। আর এই ধ্যানেই সর্বদা বিভোর হয়ে থাকবে।

মুরাকাবা-এ-ফানা বা স্বীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির ধ্যান

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- "কুল্লু মান আলাইহা ফান-ওয়া ইয়াবক্বা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালী ওয়াল ইকরাম।" (অর্থাৎ পৃথিবীর সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, কেবলমাত্র মহাপরাক্রমশালী ও সম্মানের অধিকারী আপনার প্রভুই বিরাজমান থাকবেন) -এই আয়াতটির মর্ম খেয়াল করে এই ধ্যান করবে যে, সবকিছুই একদিন ফানা হয়ে যাবে আর সকল ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দোষ থেকে মুক্ত আল্লাহ পাকই সর্বদা বিরাজিত থাকবেন। মানসচক্ষে এ অবস্থাটি অবলোকন করবে এবং এই ধ্যানেই নিমগ্ন হয়ে থাকবে। এতে উক্ত বিষয়টি তার নিকট আরো সুস্পষ্ট, আরো উদঘাটিত হবে। স্বীয় অস্তিত্বের অনিত্যতা এবং স্বীয় জ্ঞান এবং বুদ্ধির অক্ষমতা ও বিলুপ্তি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

অধ্যায় ছয়

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ) এর অমূল্য উপদেশাবলী

---হে আল্লাহর পথের পথিক, সর্বপ্রথমেই তোমার আকিদা-বিশ্বাস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুরূপ করে নেয়া উচিত।

---তুমি শরীঅতের জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা কর যেন তোমার প্রভুর অধিকার ও অন্যান্য লোকদের অধিকার ঠিকমত আদায় করতে সক্ষম হও।

---কুরআন ও রাসূলের (সাঃ) সুন্নতের অনুসরণ কর এবং অনুসরণ কর সাহাবাগণের।

---চরিত্রের মন্দ আমল-আখলাক বর্জন কর। সেগুলো হলোঃ লোভ, কাল্পনিক আশা-আকাঙ্খা, ক্রোধ, মিথ্যাকথন, গীবত, কৃপনতা, হিংসা, রিয়া, অহংকার, এবং ঘৃণা।

---চরিত্রের সুন্দর আমল-আখলাক অবলম্বন কর। সেগুলো হলোঃ সবর, শোকর, অল্পেতুষ্টি, ইলম, ইয়াকীন, আল্লাহতে সমর্পন (তাফবীয) আল্লাহর উপর নির্ভরতা (তাওয়াক্কুল), আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরে সন্তুষ্টি (রেযা বিল কাযা), এবং ভাগ্যবরণ।

---শরীঅতের অনুসরনে দৃঢ় হও এবং সকল প্রকার হারাম থেকে বেঁচে থাক।

---তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন কর।

---সর্বদা নবীর (সাঃ) সুন্নাত অনুসরণ কর এবং নিষিদ্ধ ও সন্দেহজনক কাজকর্ম থেকে বিরত থাক।

---যদি গোনাহ করে ফেল তবে তখন তখনই তাওবা কর এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ নেককাজ কর ও আল্লাহর দরবারে রোনাজারী করে ক্ষমা চাও। কখনোই তাওবা করতে বিলম্ব করোনা।

---পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় কর।

---ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত এবং নফল থেকে ফারেগ হয়ে মুর্শিদের নির্দেশিত কাজে লেগে থাক।

---অত্যধিক দোয়া দরূদ সম্পন্ন করার প্রতি আকর্ষণের চেয়ে অন্তরকে আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারা রাখা ভাল।

---যখন আল্লাহর স্মরণে তৃপ্তি লাভ হয় তখন সেজন্যে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

---সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে কর।

---কাশফ ও কারামতের আকাঙ্খী হইওনা।

---যখন বসত আসে তথা ইবাদাত-বন্দেগীতে আগ্রহ-উদ্দীপনা জাগে তখন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং শরীঅতের সীমারেখার প্রতি যত্নবান হও।

---যখন কবয আসে তথা ইবাদাত-বন্দেগীতে মন লাগে না তখনও হতাশ হইওনা বরং জোশের সাথে ইবাদাত-বন্দেগীতে লেগে থাক।

---যা অর্জন করেছ তার তুলনায় নিজেকে ছোট ভাব এবং অর্জিত বিষয়ে নিজেকে ত্রুটিযুক্ত ভাব।

---মারেফাতের গোপন তত্ত্ব-তথ্য তেমন লোকদের কাছে প্রকাশ করো না যারা এবিষয়ে অজ্ঞ।

---নিজ অন্তরের হালাত-কাইফিয়াত নিজ মুর্শিদ ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রকাশ কর না।

---পৃথিবী ও এর সংশ্লিষ্ট সকল কিছু পরিত্যাগ কর, অন্যথায় সহস্র বছরের অধ্যাত্মসাধনায়ও কিছু মিলবে না।

---অন্তর হলো স্বচ্ছ এক আয়না, এর উপর আল্লাহর নূর ছাড়া অন্যকিছু প্রক্ষিপ্ত হতে দিয়ো না।

---সর্বদা পদ-লোভ, নেতৃত্বের মোহ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও; পদলিপ্স্যা এক ধোঁকা।

---দারিদ্রে হতাশ হয়ো না বরং তোমার দারিদ্রকে সম্মানের চোখে দেখ, কেননা আল্লাহ তোমায় যা দিয়েছেন তা নবী ও ওলীদের দিয়ে থাকেন।

---সহকর্মীদের সাথে নম্রতা ও দয়া দেখাও। তাদের দোষক্রটি মার্জনা কর এবং তাদের ওজর আপত্তি গ্রহণ কর।

---সর্বদা গীবত থেকে বেঁচে থাক।

---নিজেরটা ছাড়া অন্যের ভুলক্রটির দিকে মনোযোগ দিও না।

---সকলকে নিজের চেয়ে বড় জান, কারো সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ করো না যদিও তুমি সত্যের উপর থাক।

---খাদেম হও ও অন্যের খেদমত কর।

---দরিদ্র ও অভাবীদের সঙ্গী থাক এবং আলেম-ওলীদের খেদমত কর ভদ্রতা ও সম্মানের সাথে।

---বস্তুর অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়কে সমান ভাব।

---যতটুকু সম্পদ তোমার আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাক।

---নিজের চেয়ে অন্যকে অগ্রাধিকার দাও।

---ক্ষুধা-পিপাসাকে ভালোবাস কেননা এ হলো আল্লাহর খাদ্য।

---কম হাস, বেশী কাঁদ। আল্লাহর শাস্তি ও অবহেলাকে ভয় কর।

---মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর, কারণ তা আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের সাথে বন্ধন কেটে দেয়।

---জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, কারণ এটি আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা। জান্নাত কামনা কর, এটি আল্লাহর নৈকট্য।

---প্রতিদিন বাদ ফজর ও বাদ মাগরিব সারাদিনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে নিজের কাজের হিসাব লও। উত্তম কর্মের জন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর এবং মন্দকর্মের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।

---সত্যবাদিতা ও হালাল খাবার গ্রহণকে নিজের স্বভাবে পরিণত কর।

---আনন্দ স্ফুর্তি ও হারাম ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্যে যত লোকসমাবেশ হয় সেসব থেকে দূরে থাক।

---জাহেলিয়াতের সকল রুসুম-রেওয়াজ পরিহার কর।

---ভালোবাসা, ঘৃণা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা পোষণ কর কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে।

---কারো ক্ষতি করো না এবং কারো কাছ থেকে কোন কিছুর আশা করো না।

---চিরকালের জন্যে মধ্যপন্থী হও এবং অপব্যয় ত্যাগ কর।

---অত্যধিক দুঃশ্চিন্তা পরিহার কর এবং সংশোধনমূলক মনোভাব নিয়ে থাক।

---প্রভুর বাধ্য হও, নেক হও এবং গাম্ভীর্য্য অবলম্বন কর।

---উপরোল্লিখিত সবই নেককারদের স্বভাব। যদি তেমনটি তোমারও নসীব হয় তবে তার জন্যে গর্ব করো না এবং নিজেকে উত্তম মনে করো না।

---সাধারণ মুসলমান ও নেককারদের কবর জিয়ারত কর। তাদের উদ্দেশ্যে দোয়াদরূদ পড়ে ইছালে সওয়াব কর।
---ভদ্রতা এখতিয়ার কর এবং নিজ মুর্শিদকে মেনে চল, কেননা তিনি নবীর (সাঃ) প্রতিনিধি।
---সর্বদা নিজ তরীকার মাশায়েখদের জন্যে দোয়া কর, কেননা তারা ছিলেন তোমার আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম।

সমাপ্ত